সুশির উৎপত্তি যেভাবে

হাসান নীল

সূর্যোদয়ের দেশ জাপান। জাপানিদের প্রিয় খাবার সুশি বিভিন্ন দেশের মানুষের সমান প্রিয়। দেখে মনে হয় ভাতের ভেতর মাছ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। আসলেই তাই। ভাত মাছ ঢুকিয়েই বানানো হয় খাবারটি। না খেলে এর স্বাদ বোঝা সম্ভব না। চলুন জানা যাক সুশি সম্পর্কে।

সুশির উৎপত্তি কীভাবে প্রশ্নটি অনেকের মনে উঁকি দেয়। এ নিয়ে রয়েছে একটি জাপানি লোককাহিনি। শোনা যায়, জাপানের এক বয়স্ক নারী চোরের উৎপাতে ছিলেন অতিষ্ঠ। তার ভাত পর্যন্ত চুরি করে নিয়ে যেত চোরের দল। আর তাই ভাতের হাড়িগুলোও লুকিয়ে রাখতেন বুড়ি। একবার কয়েকদিন পর গিয়ে দেখলেন লুকিয়ে রাখা ভাতগুলোতে পচন ধরেছে। সেইসঙ্গে তার ওপরে রাখা মাছগুলো মিশে গেছে। কৌতূহলী বুড়ি ভাতে মেশা মাছ জিভে নিয়ে থ বনে গেলেন। পচতে থাকা ভাতে মিশে যাওয়া মাছ খেতে এত সুস্বাদু হতে পারে ধারণা ছিল না তার। এভাবেই বুড়ির অসাবধানতার ফসল আজকের সুশি। তবে গল্পটি শুনতে চমকপ্রদ হলেও এর সুনির্দিষ্ট কোনো প্রমাণাদি নেই বলে ধোপে টেকে না।

বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত থেকে ধারনা করা হয় খাবারটি জাপানিদের বলে পরিচিতি পেলেও এর উৎপত্তি জাপানে না। চীনের অভিধানও সে কথাই বলে। চতুর্থ শতাব্দীতে চীনা ওই অভিধানে লবণাক্ত মাছ ভাতের মধ্যে রাখার কথা উল্লেখ আছে, সেইসঙ্গে ভাতের পচনের কথাও বলা হয়েছে সেখানে। এ থেকে অনুমান করা হয় ওই শতক থেকেই সুশির চল শুরু। তবে খাদ্য হিসেবে না। মাছ সংরক্ষণের উপায় হিসেবে। দীর্ঘদিন টাটকা রাখতে গাজানো বা পচা ভাতে মাছ মুড়িয়ে রাখা হতো। ভাত যখন পচতে শুরু করে তখন সেখান থেকে ল্যাকটিক অ্যাসিড সৃষ্টি হয়। এর সাথে লবণ যোগ করলে মাছে ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে মাছ পচনের হাত থেকে রক্ষা পায়। এই সংরক্ষণ প্রক্রিয়াটি দক্ষিণ এশিয়া থেকে শুরু হয়েছিল।

নবম শতকে প্রথম সুশির আবির্ভাব ঘটে এবং কম সময়ের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে। এর পেছনে বৌদ্ধ ধর্মের হাত রয়েছে। জাপানে এই ধর্মের অনুসারীরা চাইছিলেন মাংস পরিহার করতে। এ কারণে মাছের দিকে ঝুঁকেছিলেন তারা। এমন সময়ে মাছ ভাতে তৈরি সুশি পেয়ে সহজেই লুফে নিয়েছিল তারা। তখন মাছ ও গাজানো ভাতের এ মিশ্রণকে বলা হতো নারে জুশি। আর এই সুশির প্রাচীন রূপ আবার ফানা জুশি।

ফানা জুশির নাম এসেছে ফানা মাছ থেকে। এটি মূলত গোল্ডেন কার্প মাছ যা জাপানে ফানা মাছ নামে পরিচিত। ১৪ শতাব্দীর দিকে এই মাছ জাপানের ধনাঢ্য শ্রেণির খাবার টেবিলে জায়গা করে নিয়েছিল। তবে সুশি তৈরিতে বিপ্লব আসে ১৬ শতকে। ১৬০৬ সালে স্বৈরশাসক তোকুগাওয়া ইইয়াসু জাপানের রাজধানী কিয়োটো থেকে এডোতে স্থানান্তর করেন। নতুন রাজধানীতে ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের আগমন ঘটতে থাকে। ফলে আয়তন ও জনসংখ্যার দিক থেকে ১৯ শতকের মধ্যে বিশ্বের বৃহত্তম শহরগুলির একটিতে পরিণত হয় এডো। ১৭ শতকের মাঝামাঝিতে এখানে সুশি তৈরিতে নতুন দিগন্ত সূচিত হয়। এ সময় গাজন প্রক্রিয়ায় ভিনেগার দিয়ে রান্না করা ভাতের সঙ্গে মাছ মেশানো হয়। এরপর তা ছোট একটি বাকশোতে দুই ঘণ্টার জন্য রাখা হতো। নির্ধারিত সময় শেষে টুকরো করে কেটে পরিবেশন করা হতো সুশি।

তবে আধুনিক সুশির জনক বলা হয় হানায়া ইয়োহেই নামের এক ব্যক্তিকে। তিনি সুশি প্রস্তুতের সময় দুই ঘণ্টা থেকে কয়েক মিনিটে নামিয়ে এনেছিলেন। সে ১৮ শতকের কথা। জাপানের তৎকালীন রাজধানী এডোতেই থাকতেন হানায়া। তিনিই প্রথম সুমিদা নদীর কাছে সুশির স্টল খুলেছিলেন। এর আগে সুশি তৈরিতে অনেক সময় লাগলেও হানায়ার সুশি তৈরি হতো কয়েক মিনিটে। এছাড়া ভিনেগার যুক্ত ভাতের সাথে সমুদ্রের তাজা মাছ ব্যবহার করায় সংরক্ষণের প্রয়োজন হতো না। তার এই সুশির নাম ছিল নিগিরি সুশি। স্টলটি নদীর পাড়ে হওয়ায় সেতু পারাপারের সময় সহজেই মানুষের নজরে পড়তো। স্বাদে ভিন্নতা ও অল্প সময়ে প্রস্তুত করা যায় বলে সবার বেশ প্রিয় হয়ে উঠেছিল এটি। আস্তে আস্তে তা জাপানিদের ঘরের খাবারে পরিণত হয়।

জাপানিদের প্রিয় হলেও সুশি বিভিন্ন দেশের খাবার টেবিলে যায়গা করে নিয়েছে। ১৯০০ সালের দিকে যুক্তরাষ্ট্রে আবির্ভাব ঘটে সুশির। সেসময় আমেরিকার সঙ্গে জাপানের দারুণ সম্পর্ক ছিল। বন্ধু দেশের সবকিছুর প্রতিই একটি আলাদা প্রীতি কাজ করছিল দেশটির মানুষের। ১৯০৬ সালে লস অ্যাঞ্জেলেসের লিটল টোকিও পাড়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম সুশির দোকান খোলা হয়। আস্তে আস্তে দেশটির সকল শ্রেণির মানুষের কাছে সমাদৃত হতে থাকে। তবে তাদের এই সুশিপ্রীতি কমতে সময় লাগেনি। ১৯০৭ সালে জেন্টলম্যান্স চুক্তির কারণে জাপানিদের প্রতি আমেরিকান নাগরিকদের বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয়। ফলে সুশি খাওয়া কমিয়ে দেয় আমেরিকানরা। ফলে একেবারে বন্ধ না হলেও যুক্তরাষ্ট্রে কমে যায় সুশির বিক্রি।

নিউ জিল্যান্ডে সুশির প্রবেশের সাথে সংগীতশিল্পী ডেভিড বোউইর নাম জড়িয়ে আছে। ১৯৮৩ সালে সিরিয়াস মুনলাইট ট্যুরের অংশ হিসেবে অকল্যান্ডে সংগীত পরিবেশন করেন ডেভিড বোউই। শোনা যায় তিনি তার খাবার মেনুতে সুশি রাখতে বলেছিলেন। নিউ জিল্যান্ডের অধিকাংশরাই সেসময় সুশির সাথে পরিচিত ছিল না। শুধুমাত্র বিলাসবহুল রেস্তোঁরায় পাওয়া যেত এ খাবার। গুজব ছড়ায় তখন থেকেই নাকি দেশটিতে সুশি পরিচিতি হয়ে ওঠে।

অস্ট্রেলিয়ায় সুশির আগমন ১৯৭০ এর দশকের গোড়ার দিকে। এবং পরবর্তী এক দশকের মাঝেই দেশটির সর্বসাধারণের কাছে খাবারটি সমাদর পেতে শুরু করে। ১৯৯৩ সালে সেখানকার কুইন্সল্যান্ডে প্রথম সুশি বিকিকিনি শুরু হয়।

কানাডাতে জাপানিদের হাত ধরে পৌঁছেছিল সুশি। সময়টা ছিল ১৯ শতকের মাঝামাঝি। সুশি প্রবেশের অল্পদিনের মধ্যেই দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে ১৯৭৬ সালের ৩টি সুশির আউটলেট থেকে ২০১৪ সালে ৬০০টিরও বেশি হয়ে যায়।

এই দেশগুলোর বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সুশির প্রচলন রয়েছে। বাংলাদেশের মানুষজনেরও রয়েছে সুশিপ্রীতি। আজকাল বন্ধুদের আড্ডায় বা প্রিয়জনকে ট্রিট দেওয়ার বেলায় তরুণ প্রজন্ম বেছে নিচ্ছে খাবারটি। তরুণদের পাশাপাশি বয়স্করাও ঝুঁকেছেন জাপানি খাবারটির প্রতি। ফেলে রেস্তোরাঁগুলোতে বাড়ছে সুশির বিক্রি। রাজধানীর ধানমন্ডি, গুলশান, বনানী, উত্তরা ইত্যাদি এলাকায় বেড়েই চলছে সুশির দোকান।

সুশি'র উপাদানগুলো হচ্ছে তাজা বা হিমায়িত মাছের কাঁচা স্লাইস, সিরকা, মিষ্টি, লবণ মেশানো

আঠালো ভাত আর মচমচে কাগজের মতো পাতলা সামুদ্রিক শেওলার শিট বা নরি। তবে স্যামন ও টুনা মাছের সুশিই বেশি প্রিয় সুশিপ্রেমীদের কাছে। চাইলে অন্যান্য উপাদানও মেশানো যেতে পারে। এরমধ্যে স্যামন মাছের ডিম, ভাপিয়ে নেওয়া কাঁকড়া, চিংড়ি, অক্টোপাস, অ্যাভোকাডো, শসা ও গাজরকুচি, টোফু, রোল করা মিষ্টি দেওয়া ডিমের অমলেট ইত্যাদি। নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছা করছে এর স্বাদ সম্পর্কে। এর ভিনেগার মেশানো ভাতের টক মিষ্টি স্বাদ সত্যিই পাগল করার মতো। আর যদি ওয়াসাবি পেস্ট ও সয়াসসে ডুবিয়ে খাওয়া হয় তাহলে যেন ব্যাপারটি জমে যায়।

হাজার বছরের পুরানো এই খাবারটি আজও দেশে দেশে ভোজন রসিকদের মন জয় করে আসছে। তবে স্থান কাল পাত্রভেদে সময়ের সঙ্গে বদল এসেছে সুশিতে। বিভিন্ন দেশে সুশি বিভিন্ন নামে পরিচিত। এই যেমন বাংলাদেশে এসে সুশি হয়েছে দেশি সুশি। সেইসঙ্গে এতে এসেছে আমূল পরিবর্তন। অন্য দেশে সামুদ্রিক মাছ দিয়ে তৈরি হলেও এদেশে সুশি তৈরিতে মাছ মাংসের কোনো বাছবিচার নেই। চিকেন দিয়েও বানানো হয় সুশি। কখনও সিদ্ধ শুশি ডিম আর বিস্কুটের গুড়ায় মেখেও ভেজে খাওয়া হচ্ছে।

চিরাশি টেমাকি ও ওশি নামে তিন ধরনের সুশি রয়েছে। এরমধ্যে চিরাশি নামের সুশি তৈরি করতে হয় এক বাটি ভাতের ওপর মাছ দিয়ে। এটি খেতে হয় চপস্টিকস দিয়ে। টেমাকি নামের সুশিটি রোল আকৃতির। এটি হাতে তুলে খেতে হয়। ওশি নামের সুশিটি বর্গ বা আয়তক্ষেত্র আকৃতির আঠালো সুগন্ধযুক্ত।

তবে বিশ্বজুড়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় যে সুশি সেটির নাম নিগিরি। এটি কাঁচা মাছ, ভাত ও শৈবাল দিয়ে তৈরি করা হয়। এটি রোল করে কেটে পরিবেশন করা হয়। কেউ চাইলে সঙ্গে পাতলা করে কাটা কাঁচা মাছের টুকরাও নিতে পারেন পাতে।

এদিকে আদি নিবাস জাপানে সুশি আর সুশি নেই। নাম বদলে হয়ে গেছে 'ক্যালিফোর্নিয়া রোল'। এটি মূলত জাপানি সুশির মার্কিন সংস্করণ। আমেরিকান সুশি বলে থাকে একে।

বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তার কারণে জুন মাসের ১৮ তারিখে আর্ন্তজাতিক সুশি দিবস ঘোষণা করা হয়েছে। দুনিয়াজুড়ে পালিত হয় দিনটি।